গার্মেন্টস শিল্পে রাষ্ট্র-ব্যবসা আঁতাত

মাহা মির্জা ও শহিদুল ইসলাম সবুজ

বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্প বিকাশের উপাদানগুলো অনুসন্ধান করলে স্পষ্ট হয় যে, এই শিল্প বিকাশের মূলে রয়েছে সস্তা শ্রম এবং গার্মেন্টস খাতে বিভিন্ন সরকারের অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতা। একদিকে স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ যেমন প্রথম থেকেই নানা ধরনের অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা পেয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিকাশে সরকার দীর্ঘদিন ধরেই নানা ধরনের আর্থিক ও নীতিগত সহায়তা দিয়ে এসেছে। এর মধ্য দিয়ে গার্মেন্টস খাতের মালিকরা আর্থিকভাবে ফুলেফেঁপে উঠলেও এই খাতের ৪০ লাখ শ্রমিক এখন পর্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করছে। এই প্রবন্ধে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশে রাষ্ট্র ও ব্যবসার নানামুখী আঁতাত বা সমঝোতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

সর্বজনকথার প্রথম সংখ্যায় বাজার অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা, রাষ্ট্রের সঙ্গে পুঁজির মালিক বা ব্যবসায়িক শ্রেণির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্র, ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র কেন এবং কী প্রক্রিয়ায় পুঁজির মালিকের প্রতিনিধিত্ব করতে বাধ্য হয়, এইসব প্রশ্ন সামনে রেখে একটি তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে সামনে এসেছিল বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে রাষ্ট্র-ব্যবসা আঁতাতের প্রশ্নটি। যে দিবস সামনে রেখে এ সংখ্যায় আমরা এদেশের গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশে রাষ্ট্র ও ব্যবসার নানামুখী আঁতাত বা সমঝোতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি (দেখুন মির্জা, ২০১৪: ২৪-৩০)।

তিন দশক ধরে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের দুই হাজার কোটি ডলারের গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশের সবটুকু কৃতিত্ব মালিকপক্ষ দাবি করলেও একটু খতিয়ে দেখলেই স্পষ্ট হয় যে, এই শিল্প বিকাশের মূলে রয়েছে সস্তা শ্রম এবং গার্মেন্টস খাতে বিভিন্ন সরকারের অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতা। একদিকে স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ যেমন প্রথম থেকেই নানা ধরনের অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা পেয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিকাশে সরকার দীর্ঘদিন ধরেই নানা ধরনের আর্থিক ও নীতিগত সহায়তা দিয়ে এসেছে। আবার তিন দশক ধরে একচেটিয়াভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করে গার্মেন্টস খাতের মালিকরা আর্থিকভাবে ফুলেফেঁপে উঠলেও এই খাতের ৪০ লাখ শ্রমিক এখন পর্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করে, যার বৃহৎ অংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। ন্যূনতম মজুরির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে যথাযথ উদ্যোগের অভাব, যা দীর্ঘদিন যাবৎ মালিকপক্ষের স্বার্থই সংরক্ষণ করে এসেছে।

> দেশের অন্যান্য বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগ করও পাওয়া যায় না তৈরি পোশাক কারখানার মালিকদের কাছ থেকে। বরং ওই অর্থবছরে পোশাক খাতের মালিকরা সরকারের কাছ থেকে নগদ সহায়তা নিয়েছে এক হাজার ৪১২ কোটি সাত লাখ ৬০ হাজার টাকা।

কেন এবং কী প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র পুঁজির মালিক বা ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর থাকে, সেই আলোচনায় রাষ্ট্রের কাঠামোগত বাধ্যবাধকতার তত্ত্বটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এখানে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রাষ্ট্র ও ব্যবসার পারস্পরিক সম্পর্ক বা পুঁজির মালিকের প্রতি রাষ্ট্রের কাঠামোগত বাধ্যবাধকতা তাত্ত্বিক আলোচনার একটি অংশ পুনরুল্লেখ করা হলো। 'কাঠামোগত বাধ্যবাধকতা'র ব্যাখ্যাটি এ রকম: একদিকে রাষ্ট্রকে টিকে থাকতে বৃহৎ বাণিজ্যিক বিনিয়োগের লভ্যাংশের ওপর নির্ভর করতে হয়, আবার অন্যদিকে ব্যবসায়িক শ্রেণি জাতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগের সক্ষমতার কারণে রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে তারা একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পায় (পূর্বোক্ত: ২৪-২৫)। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করতে গেলে এ রকম ধারণা দেয়া হয় যে, পুঁজির মালিক বা ব্যবসায়িক গোষ্ঠী রাতারাতি উৎপাদন কমিয়ে দিতে পারে, কর্মী ছাঁটাই করতে পারে এবং কারখানা বন্ধ করে বিনিয়োগ অন্য দেশে সরিয়ে নিতে পারে। বলা হয় যে, এই প্রক্রিয়ায় পুঁজি সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং বেকারত্ব বেড়ে রাষ্ট্রের কর আদায় প্রক্রিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার কোনো সরকারি নীতি যদি মুনাফা পুঞ্জীভূতকরণ প্রক্রিয়াকে রোধ করে সম্পদের পুনর্বণ্টন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত হয়, সেটাও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে নিরুৎসাহিত করে।

কাজেই দেশের 'অর্থনীতির গতি শ্লথ হতে পারে' এমন কোনো নীতিমালা প্রণয়নের আগে সরকারের নীতিনির্ধারকরা যেমন জাতীয় অর্থনীতির লাভ-ক্ষতির বিষয়টি মাথায় রাখেন, তেমনি নির্বাচনকালীন নিজস্ব লাভ-ক্ষতির বিষয়টিও প্রাধান্য দেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, এইসব কারণেই রাষ্ট্র অব্যাহতভাবে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর চাহিদা জোগানে তৎপর থাকে। অন্যদিকে কৃষক-শ্রমিক গোষ্ঠী বা ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করার কোনো সহজ উপায় না থাকায় ব্যবসায়িক শ্রেণি অব্যাহতভাবেই রাষ্ট্রের ওপর তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নীতি চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ পায়। বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি গার্মেন্টস খাতে রাষ্ট্রের অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতা এবং সেই সঙ্গে মালিক স্বার্থের পক্ষে এবং শ্রমিক স্বার্থের বিপরীতে রাষ্ট্রের স্পষ্ট অবস্থান। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা পরীক্ষা করা হবে।

লেখাটি আমরা দুই অংশে ভাগ করেছি। প্রথম অংশে গার্মেন্টস শিল্পে রাষ্ট্রের অব্যাহত আর্থিক ও নীতিগত পৃষ্ঠপোষকতার কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছি। দ্বিতীয় অংশে রাষ্ট্র ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে কী প্রক্রিয়ায় অব্যাহতভাবে শ্রমিক স্বার্থের বিপরীতে

অবস্থান করে, সেই বিশ্লেষণ করেছি।

গার্মেন্টস শিল্পে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ১

১৯৮২ সালের শিল্পনীতিতে আমদানি-বিকল্প শিল্পনির্ভরতা (import substituting industrialization (ISI)) থেকে বেরিয়ে এসে বেসরকারি খাত ভিত্তিক রপ্তানিমুখী শিল্পকে প্রাধান্য দেওয়া হলে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার বিভিন্ন নীতিগত সহায়তা দিয়ে এই শিল্প বিকাশে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। পোশাক খাতের মালিকরাও বিভিন্ন সময়ে স্বীকার করে থাকে যে পোশাক খাতের ব্যাপক অগ্রগতির পেছনে রাষ্ট্র প্রদত্ত বন্ড সুবিধা, ডিউটি ড্র ব্যাক সুবিধা, স্থানীয় এলসি এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের ঋণের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। এখানে পোশাক খাতে রাষ্ট্রের আর্থিক ও নীতিগত পৃষ্ঠপোষকতার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

করবৈষম্য: সাধারণত কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক আয়ের ওপর সর্বোচ্চ সাড়ে ৪২ শতাংশ হারে কর দিতে হয়। অথচ আমাদের দেশের পোশাক কারখানার মালিকরা নামমাত্র কর দেয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান থেকে এক হাজার ২৭৬ কোটি টাকা কর পেয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আগের পুরো অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ৮৮৬ কোটি টাকা। দেশের অন্যান্য বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগ করও পাওয়া যায় না তৈরি পোশাক কারখানার মালিকদের কাছ থেকে। বরং ওই অর্থবছরে পোশাক খাতের মালিকরা সরকারের কাছ থেকে নগদ সহায়তা নিয়েছে এক হাজার ৪১২ কোটি সাত লাখ ৬০ হাজার টাকা। এছাড়াও পোশাক কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে কর ফাঁকিরও নানা ধরনের অভিযোগ রয়েছে এনবিআরে।

উৎসে কর সুবিধা: ২০১৩ সাল পর্যন্ত পোশাক কারখানার মালিকদের রপ্তানির সময় উৎসে কর দিতে হতো দশমিক ৮০ শতাংশ (০.৮০%)। উল্লেখ্য উৎসে করই চূড়ান্ত কর হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মাধ্যমে অন্য সব ধরনের কর থেকে দায়মুক্তি পায় কারখানার মালিক। ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত এই হার ছিল দশমিক ৬০ শতাংশ। এর আগে এই হার ১ দশমিক ২০ শতাংশ করার ঘোষণা থাকলেও পোশাক কারখানার মালিকদের চাপের মুখে তা কমাতে বাধ্য হয়েছিল সরকার। ২০১৪ সালের এপ্রিলে উৎসে কর কমিয়ে ০.৩০% করা হয়েছে।

বন্ড সুবিধায় ক্ষতি: বন্ড সুবিধার আওতায় প্রয়োজনীয় সুতা, কাপড়সহ কাঁচামাল আনতে শুল্ক দিতে হয় না রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার মালিকদের। তৈরি পোশাক খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রপ্তানি খাতও (প্যাকেজিং, এক্সেরিজ ইত্যাদি) এই সুবিধা পেয়ে আসছে। এখানে উল্লেখ্য যে, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড) ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত শিল্প খাতকে সরকার এই বন্ড সুবিধা দেয় না। এনবিআরের এক হিসাবে দেখা গেছে, ২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট এক লাখ ১০ হাজার কোটি টাকার বন্ড সুবিধা নিয়েছে তৈরি পোশাক কারখানার মালিকরা। অর্থাৎ এই বন্ড সুবিধা না থাকলে পোশাক কারখানার মালিকদের সমপরিমাণ অর্থ শুল্ক-কর হিসেবে দিতে হতো।

ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা: ১৯৮৬-৮৭ সালে পোশাক শিল্পের জন্য সরকার চালু করে স্থানীয় ঋণপত্র বা ব্যাক টু ব্যাক এলসির ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সব ধরনের কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক পণ্য আনতে উদ্যোক্তাকে কেবল রপ্তানির আদেশ আনতে হয়। বাদবাকি সম্পূর্ণ অর্থায়নের দায়িত্ব নেয় ব্যাংক। অর্থাৎ পোশাক তৈরি থেকে প্যাকেজিং পর্যন্ত তাদের কোনোরূপ নিজস্ব বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে না। বিদেশ থেকে কাপড় বা সুতা আনতে অথবা দেশের মধ্য থেকে তা সংগ্রহ করতে 'ব্যাক টু ব্যাক এলসি' অথবা স্থানীয় ঋণপত্রের মাধ্যমে অর্থের জোগান দেয় ব্যাংক।

নীতিবৈষম্য: তৈরি পোশাক খাতের মূলধনী যন্ত্রপাতি আনতে মাত্র ১ শতাংশ আমদানি শুল্ক দেয় উদ্যোক্তারা। আর অন্য খাতের মূলধনী যন্ত্রপাতি আনতে ৩ শতাংশ শুল্ক দিতে হয়।

* ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে তৈরি পোশাক খাতকে কোনো ধরনের মূল্য সংযোজন কর দিতে হয় না।

* তিন দশক ধরে তৈরি পোশাক খাতকে ট্যাক্স হলিডে বা কর অবকাশ সুবিধা দিচ্ছে সরকার।

> পোশাক তৈরি থেকে প্যাকেজিং পর্যন্ত তাদের কোনোরূপ নিজস্ব বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে না। বিদেশ থেকে কাপড় বা সুতা আনতে অথবা দেশের মধ্য থেকে তা সংগ্রহ করতে 'ব্যাক টু ব্যাক এলসি' অথবা স্থানীয় ঋণপত্রের মাধ্যমে অর্থের জোগান দেয় ব্যাংক।

* বাংলাদেশ ব্যাংক একমাত্র পোশাক খাতেই খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে কোনো এককালীন জমা বা ডাউন পেমেন্ট নেয় না। এছাড়াও পোশাক খাতের ২৭০টি রুগ্ন শিল্পের আসল ঋণ ও সুদ মওকুফ করে এবং ঋণকে ব্লক করে রেখে নতুন সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

* ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে পোশাক ও বস্ত্র খাতে। দেশের অন্য কোনো রপ্তানিমুখী খাতের ব্যবসায়ীরা এই ধরনের নগদ সহায়তা পায় না।

* ইসিসি বা এক্সপোর্ট ক্যাশ ক্রেডিটের (রপ্তানির জন্য নগদ ঋণ) নামে শ্রমিকের মজুরির অর্থও দেয় ব্যাংক। ব্যাক টু ব্যাক এলসি ও ইসিসির সুদের হার ১৩ শতাংশ। দেশের অন্য যে কোনো খাতের উদ্যোক্তাদের এই ঋণ নিতে সুদ দিতে হয় অনেক বেশি। উৎপাদন খাতের বাইরের উদ্যোক্তাদের সুদ দিতে হয় ১৭ থেকে ১৮ শতাংশ পর্যন্ত।

নগদ সহায়তা: বিগত পাঁচ বছরে রপ্তানিমুখী বস্ত্র খাতের মালিকেরা সরকারি কোষাগার থেকে চার হাজার ২১৫ কোটি টাকার নগদ সহায়তা নিয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের ১৯ মার্চ পর্যন্ত সরকার থেকে প্রায় ৯২৩ কোটি দুই লাখ টাকার নগদ সহায়তা পেয়েছে পোশাক খাতের মালিকরা। ২০১১-১২ অর্থবছরে পোশাক খাতে এক হাজার ৪১২ কোটি সাত লাখ ৬০ হাজার টাকা নগদ সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। এর আগের বছর ২০১০-১১ অর্থবছরে এই সহায়তার পরিমাণ ছিল ৮৭৭ কোটি ১১ লাখ টাকা।

১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বস্ত্র ও পোশাক খাতকে ২৫ শতাংশ নগদ সুবিধা দেয় সরকার। পরে ২০০২-০৩ অর্থবছরে তা কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে রপ্তানি প্রত্যাবসানের বিপরীতে ৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে পোশাক খাতকে। তৈরি পোশাক খাতের মালিকরা বিদেশ

থেকে 'এক্সেসরিজ' আনতে রপ্তানি ঋণ হিসেবে ৭ শতাংশ হারে ব্যাংকের অর্থায়ন পায়। আবার 'এক্সপোর্ট রিটেনশন কোটায়' রপ্তানি করে যত ডলার আয় করে, তার ১০ শতাংশ নিজের ব্যাংক হিসাবে রাখতে পারে তারা।

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের ঋণ সুবিধা: তৈরি পোশাক খাতে ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগ ৩৪ হাজার ৬৪৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক মিলে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন আটটি ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৬৯১ কোটি টাকা। আর বেসরকারি ব্যাংক ও বিদেশি ব্যাংকগুলো পোশাক খাতে মোট বিনিয়োগ করেছে ২২ হাজার ৯৫২ কোটি টাকা। ২০১৩ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, পোশাক খাতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক। এ খাতে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ সাত হাজার ৮০৬ কোটি টাকা। পোশাক খাতে মোট এক হাজার ২৭৩ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক জনতা ব্যাংক লিমিটেড। এছাড়াও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ব্যাংক পোশাক খাতে ৮৮১ কোটি টাকা ও রূপালী ব্যাংক ২৯৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন বেসিক ব্যাংক পোশাক খাতে ঋণ দিয়েছে এক হাজার ১৮ কোটি টাকা।

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, এদেশের গার্মেন্টস শিল্পে শুরু থেকেই বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে এই শিল্পের ক্রমবর্ধমান বিকাশ প্রায় অসম্ভব ছিল। তিন দশক ধরে বিভিন্ন সরকার কেবল আর্থিক বা নীতিগত সহায়তাই নয়, গার্মেন্টস খাতের মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে অব্যাহতভাবে শ্রমিক স্বার্থের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে।

রাষ্ট্র ও মালিকপক্ষের বিভিন্ন আঁতাতমূলক সম্পর্ক

গত তিন দশকের ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা শ্রমিকদের ন্যায্য আন্দোলনের বিপরীতে রাষ্ট্রযন্ত্র ও বিজিএমইএর আঁতাতমূলক অবস্থানটিও বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অংশে রাষ্ট্র ও মালিকপক্ষের বিভিন্ন আঁতাতমূলক অবস্থান/পদক্ষেপের নমুনা দেওয়া হলো। এই পর্বের আলোচনাকে আমরা চার ভাগে ভাগ করেছি।[২]

ক. শ্রম আইন ও ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে রাষ্ট্রের অসহযোগিতা
খ. রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ট্রেড ইউনিয়ন ও তার ভূমিকা
গ. মালিকপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় ট্রেড ইউনিয়ন ও তার ভূমিকা
ঘ. মজুরি বোর্ড, মালিকদের আধিপত্য ও রাষ্ট্রপক্ষের ভূমিকা।

শ্রম আইন ও ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে রাষ্ট্রের অসহযোগিতা

২০১৩ সালের সংশোধিত শ্রমনীতির শর্তাবলি প্রকৃতপক্ষেই শ্রমিক বান্ধব কি না, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এই অংশে আমরা শুধুমাত্র ২০১৩ সালে গৃহীত শ্রম আইনের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের (ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্প সম্পর্ক) কিছু ধারা-উপধারা বিশ্লেষণ করব।

প্রথমত, ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকের মৌলিক অধিকার। এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে মালিকপক্ষের অন্যায্য আচরণ ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী যে কোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এছাড়া মজুরি বা অন্যান্য শ্রমিক ইস্যুতে দরকষাকষির ক্ষেত্রেও ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অথচ খোদ শ্রম আইনেই 'অংশগ্রহণকারী কমিটি' নামক এমন একটি কমিটি গঠন করার বিধান রাখা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে ট্রেড ইউনিয়নের মতো শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম যেন গড়ে উঠতে না পারে, তারই একটি প্রয়াস মাত্র। ২০১৩ সালের সংশোধিত শ্রমনীতির ত্রয়োদশ অধ্যায় (ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্প সম্পর্ক), ধারা ২০৫(১) এ বলা হয়েছে, 'অন্যূন পঞ্চাশ জন শ্রমিক সাধারণত কর্মরত আছেন এইরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মালিক উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় তাঁহার প্রতিষ্ঠানে একটি অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করিবেন?' ধারা ২০৫(৬) অনুযায়ী 'যে প্রতিষ্ঠানে কোন ট্রেড ইউনিয়ন নাই, সে প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধিগণ উহাতে কর্মরত শ্রমিকগণের মধ্য হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় নির্বাচিত হইবেন?' অর্থাৎ যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন নেই, সেখানে বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার কোনো বাধ্যবাধকতা তো নেই-ই, বরং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন না হওয়া পর্যন্ত তথাকথিত 'অংশগ্রহণকারী কমিটি'কেই ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হিসেবে গণ্য করা হবে। বিভিন্ন কারখানায় 'অংশগ্রহণকারী কমিটি'র সদস্য ছিলেন বা আছেন এমন শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সাধারণত এই ধরনের 'অংশগ্রহণকারী কমিটি' সম্পূর্ণভাবেই মালিকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। এখানে শ্রমিক প্রতিনিধিরা তাদের ন্যায্য দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রে সোচ্চার হয়ে ওঠা মাত্রই তাদের ছাঁটাই করা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র মালিকের আস্থাভাজন শ্রমিকদের নিয়েই গঠন করা হয় অংশগ্রহণকারী কমিটি। তাই এটি পরিষ্কার যে শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়নের 'বিকল্প' হিসেবে 'অংশগ্রহণকারী কমিটি'র মতো একটি লোকদেখানো কমিটির বিধান রাখার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণির 'কল্যাণ' বা 'অংশগ্রহণ' এর একটি 'আই ওয়াশ' তৈরি করা হয়েছে, যা মূলত ন্যায্য দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আন্দোলনবিমুখ করে রাখারই একটি রাষ্ট্রীয় কৌশল মাত্র।

> প্রশ্ন ওঠে, শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়নের বিধান থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে মাঠপর্যায়ে কাজ করছে এমন শ্রমিক সংগঠনসমূহ ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন পাচ্ছে না কেন?

এখন প্রশ্ন ওঠে, শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়নের বিধান থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে মাঠপর্যায়ে কাজ করছে এমন শ্রমিক সংগঠনসমূহ ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন পাচ্ছে না কেন? এখানেই শ্রম আইনে উল্লিখিত ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলির 'শ্রমিক অবান্ধব' দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রম আইন ২০১৩, ত্রয়োদশ অধ্যায় (ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্প সম্পর্ক) ধারা ১৭৯, উপধারা ২ বলছে, 'শ্রমিকগণের কোন ট্রেড ইউনিয়ন এই অধ্যায়ের অধীন রেজিস্ট্রিকরণের অধিকারী হইবে না, যদি না যে প্রতিষ্ঠানে উহা গঠিত হইয়াছে, সে প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মোট সংখ্যার অন্যূন শতকরা ত্রিশ ভাগ শ্রমিক উহার সদস্য হন।' অর্থাৎ শ্রম আইন ২০১৩ অনুযায়ী, যে কোনো

কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করতে ওই কারখানার শতকরা ৩০ ভাগ শ্রমিকের সদস্যপদ অপরিহার্য। শ্রমিক সংগঠকদের মতে, শ্রম আইনের এই ধারাটি বৈষম্যমূলক এবং মালিকবান্ধব। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ট্রেড ইউনিয়ন করতে আগ্রহী সংগঠনসমূহ শতকরা ৩০ ভাগ সদস্যপদ সংগ্রহ করার প্রক্রিয়ায় বিভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়।

এখানে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের এ সংক্রান্ত অভিযোগগুলো তুলে ধরা হলো:

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা: বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কোনো কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এর শ্রমিক উদ্যোক্তা এবং সদস্যপদে আগ্রহী শ্রমিকদের চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করার প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিকদের সদস্যপদের জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করার প্রয়োজন পড়ে। এই প্রক্রিয়া শুরু হলেই চিহ্নিত সংগঠকদের চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়াও শুরু হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকরা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে পরবর্তীতে অন্য কারখানায় চাকরি পায় না।

এখানে শ্রমিক সংগঠন 'গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম' এবং 'টেক্সটাইল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন' এর ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো:

তারিখ	*কারখানার নাম*	*এলাকা*	*ছাঁটাইকৃত শ্রমিকের সংখ্যা*
২০০৬	এস সুহি ইন্ডাস্ট্রিয়াল		৩৫০
এপ্রিল-মে ২০০৬	এসকিউ গ্রুপ	গাজীপুর	১০০ জনের বেশি
মার্চ ২০১৪	টপ স্টাইল	গাজীপুর	৫০
মার্চ ২০১৪	আজিম গ্রুপ	সাভার	২৫
নভেম্বর ২০১৪	মেট্রিকস	গাজীপুর	১৪
ডিসেম্বর ২০১৪	এনআর গ্রুপ	বিসিক, নারায়ণগঞ্জ	৭০
ডিসেম্বর ২০১৪	স্টার লাইট	গাজীপুর	৩০০
ডিসেম্বর ২০১৪	হাসিন তাইবা	শ্রীপুর, গাজীপুর	৩০
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৪	প্যান্ডোরা গার্মেন্টস	গাজীপুর	৭
জানুয়ারি ২০১৫	আরএকে গ্রুপ	গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ	১০০
জানুয়ারি ২০১৫	জেমিনি	গুলশান	৪৫
জানুয়ারি ২০১৫	রিদিশা গার্মেন্টস	নয়নপুর, গাজীপুর	২০
জানুয়ারি ২০১৫	রাবাব ফ্যাশনস লিমিটেড	বড়বাড়ী, গাজীপুর	৪
মার্চ ২০১৫	কিম	সাভার	৬
মার্চ ২০১৫	আল মুসলিম	সাভার	১১
নভেম্বর ২০১৪-মার্চ ২০১৫	অনন্ত গার্মেন্টস লিমিটেড	নিশ্চিন্তপুর, আশুলিয়া	২৫০
২০১৫	আবীর ফ্যাশনস	কাঠেরপুল, নারায়ণগঞ্জ	১০০

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে উত্তরায় সোয়েটার বুটিক, উত্তরার হ্যাসং কুরিয়া, সাভার ইপিজেডের রিং সাইন, এবং গাজীপুরের ক্রিস্টাল কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় এবং বিভিন্ন দাবিদাওয়া ও আন্দোলনে ট্রেড ইউনিয়নের সম্পৃক্ততার কারণে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।

শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের: এছাড়াও যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের একপর্যায়ে মালিকপক্ষ থেকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা একটি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সাধারণত দুই ধরনের মামলা হয়ে থাকে– লেবার কোর্টের অধীনে মামলা এবং ফৌজদারি বিধি অনুযায়ী মামলা। কারখানার মালামাল চুরি বা লুট, উৎপাদনে ক্ষতি, নিয়মবহির্ভূতভাবে ধর্মঘট ইত্যাদির অভিযোগ তুলে লেবার কোর্টের অধীনে মামলা করা হয়। কারখানার বাইরে পাবলিক প্রপার্টি, রাস্তাঘাট বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভাঙচুরের ক্ষেত্রে ফৌজদারি বিধি অনুযায়ী মামলা হয়ে থাকে। নিচে এ সম্পর্কিত কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

* ২০১২ সালে আশুলিয়ায় অবস্থিত ইয়াগি গার্মেন্টসের অন্যায়ভাবে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলে একসময় মালিকপক্ষ থেকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ভাঙচুরের অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। মামলার ভয়ে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অনেক শ্রমিক কারখানা ছাড়তে বাধ্য হয়।

* ২০১৩ সালে নাদিরা গার্মেন্টসে টিফিন বিলে অনিয়মের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এ সময় অসদাচরণের অভিযোগ তুলে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। একপর্যায়ে বেশ কয়েকজন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়।

* ২০১৪ সালে শ্রীপুর, গাজীপুরে অবস্থিত হাসিন তাইবা কারখানায় ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়, যা এখন পর্যন্ত বলবৎ আছে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে আছে গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম। মালিকপক্ষের সঙ্গে দুবার চুক্তি হলেও পরবর্তীতে চুক্তি ভঙ্গ করে ১৫০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। প্রথম দফায় ৩৩ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, দ্বিতীয় দফায় মামলা করা হয় ১৭ জনের বিরুদ্ধে।

* ২০১৪ সালে গাজীপুরে অবস্থিত ক্রিস্টাল সোয়েটার নামক কারখানায় বকেয়া বেতন ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাই করা হয় এবং ৩৩ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়

শ্রমিক সংগঠকদের মতে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে সকলকে জানিয়ে কমিটি গঠন করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা প্রায় অসম্ভব। আবার এ ধরনের সংগঠনের কার্যকলাপ গোপনে করাও সম্ভব নয়। তাই শ্রম আইনে থাকলেও বাস্তবে মালিকপক্ষ বা সরকারের

সরাসরি সহযোগিতা বা পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করা প্রায় অসম্ভব। উল্লেখ্য, শ্রম অধিদপ্তর এ বিষয়ে অবহিত হলেও এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তাদের দেখা যায়নি। বরং বিভিন্ন সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন করতে আগ্রহী সংগঠনগুলো শ্রম অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ আনে।

শ্রম অধিদপ্তরে ঘুষ দাবি করার অভিযোগ: বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, কারখানার শতকরা ৩০ ভাগ শ্রমিকের স্বাক্ষরসহ 'ডি ফরম' পূরণ করে নিবন্ধনের জন্য দরখাস্ত জমা দেওয়ার পরও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ঘুষ দাবি করে থাকেন। কিন্তু সরকার সমর্থিত বা বিজিএমইএ সমর্থিত সংগঠনসমূহ এই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় না। এছাড়াও অভিযোগ আছে যে ২০১৩ সালের সংশোধিত শ্রম আইনে শ্রম পরিচালক বা রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন কার্যালয়কে দেওয়া হয়েছে একচেটিয়া ক্ষমতা চর্চার সুযোগ। যে কারণে স্বাধীনভাবে কাজ করা শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠেছে।

২০১৩ সালের সংশোধিত শ্রম আইনে শ্রম পরিচালক বা রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন কার্যালয়কে দেওয়া হয়েছে একচেটিয়া ক্ষমতা চর্চার সুযোগ। যে কারণে স্বাধীনভাবে কাজ করা শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠেছে।

এ প্রক্রিয়ায় যেসব শ্রমিক সংগঠন বিভিন্ন সময়ে দরখাস্ত করে বা চেষ্টা করেও শ্রম অধিদপ্তর থেকে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন পেতে ব্যর্থ হয়েছে, তার মধ্যে কিছু সংগঠনের তালিকা দেওয়া হলো:

১। গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম
২। বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
৩। বাংলাদেশ ও এসকে গার্মেন্টস অ্যান্ড টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন
৪। গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট
৫। গার্মেন্টস মজদুর ইউনিয়ন
৬। সমন্বিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
৭। বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
৮। বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
৯। জাতীয় সোয়েটার গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
১০। বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন
১১। গার্মেন্টস শ্রমিক সভা
১২। জাতীয়তাবাদী গার্মেন্টস শ্রমিক দল।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ট্রেড ইউনিয়ন ও তার ভূমিকা

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সকল শ্রমিক সংগঠনই স্বাধীন-সার্বভৌমভাবে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে, বিষয়টি তা নয়। দেশে এই মুহূর্তে বেশকিছু ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এর একটি বড় অংশ গঠিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অথবা মালিকপক্ষের অর্থায়নে। ২০১৪ সালের আগস্টে তোবা আন্দোলনের ঠিক পর পর নৌমন্ত্রী শাজাহান খানের নেতৃত্বে ৫২টি শ্রমিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় গার্মেন্টস শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ। তবে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, এই জোটে ৫২টি সংগঠনের অস্তিত্ব নেই। বরং সব মিলিয়ে ২৫ থেকে ৩০টি সংগঠনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। গুরুতর অভিযোগ আছে যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলোর একটি বড় অংশই শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণের পরিবর্তে সরকার ও মালিকপক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের সময়ে এই তালিকার বেশ কিছু সংগঠনকে সাধারণ শ্রমিকের ন্যায্য দাবিদাওয়ার পক্ষে থাকার পরিবর্তে সরকার ও মালিকপক্ষের হয়ে মাঠে থেকে আন্দোলন যেন দানা বাঁধতে না পারে বা সফল হতে না পারে, সে ধরনের কার্যকলাপে নিয়োজিত থাকতে দেখা গেছে। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সাধারণ শ্রমিকদের হুমকি-ধামকি দিয়ে দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রে আপোস করতে প্ররোচিত করায় এই সংগঠনগুলো বরাবরই ভূমিকা রেখে এসেছে। আবার মাঠপর্যায়ের আন্দোলনে উপস্থিতি না থাকলেও বিভিন্ন সময়ে বিজিএমইএ বা সরকারের কাছে দেন-দরবারের সময় এদের অনেকেরই সরব উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

শ্রমিক আন্দোলনে হুমকি:

তোবা গার্মেন্টস: ২০১৪ সালে ঈদের আগে বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে তোবা গার্মেন্টসের প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক অনির্দিষ্টকালের জন্যে অনশন শুরু করে। তোবা গার্মেন্টসের মালিক দেলোয়ার হোসেন জেলে থাকা অবস্থায় বিজিএমইএর প্রতিনিধিরা বকেয়া বেতনের কিছু অংশ পরিশোধের ঘোষণা দিলে অনশনকারী শ্রমিকরা পুরো বেতন পরিশোধ না করা পর্যন্ত অনশন চালিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। অনশন চলাকালে একপর্যায়ে বাড্ডার হোসেন মার্কেটে অবস্থিত তোবা কারখানায় পুলিশ আক্রমণ চলায়। এখানে উল্লেখ্য যে সরকার ও বিজিএমইএ সমর্থিত শ্রমিক সংগঠনগুলো এ সময় অর্ধেক বেতন নেওয়ার জন্যে অনশনকারী শ্রমিকদের ওপর নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। সরকারি দলের ক্যাডারদেরও দেখা যায় এই শ্রমিক সংগঠনগুলোকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতে। একপর্যায়ে এই ধারার শ্রমিক সংগঠনগুলো সরকারি দলের ক্যাডারদের সহায়তায় মধ্য বাড্ডায় অবস্থিত হোসেন মার্কেটের সামনে অনশনকারী শ্রমিকদের পক্ষে অবস্থান করা বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীদের ওপর আক্রমণ চালায়। এ সময় পুলিশকেও তাদের পক্ষে অবস্থান নিতে দেখা যায়।

ফুজি গার্মেন্টস: ২০১৩ সালে নারায়ণগঞ্জের ফুজি গার্মেন্টসে বকেয়া বেতনের দাবিতে এবং অন্যায়ভাবে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হলে শ্রমিক সংগঠন গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। আন্দোলনের একপর্যায়ে শ্রম আইন লঙ্ঘন করে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। টানা আন্দোলনের একপর্যায়ে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয় শ্রমিক। শ্রমিকরা পুরো বকেয়া বেতন না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে সরকার সমর্থিত শ্রমিক সংগঠনের কর্মীরা বেতন নেওয়ার জন্য আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে।

এস সুহি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক: ২০০৬ সালে আশুলিয়ায় অবস্থিত এস সুহি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নামক কারখানায় পিস রেট ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই শুরু

করে। ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হলে একপর্যায়ে সরকার সমর্থিত শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং সরকারদলীয় ক্যাডাররা একত্রে মিলিত হয়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশসহ আক্রমণ চালায় এবং কারখানা থেকে সরে যেতে বাধ্য করে। সংঘর্ষের একপর্যায়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় একজন শ্রমিক।

এসকিউ গ্রুপ-এফএস সোয়েটার: ২০০৬ সালে গাজীপুরে অবস্থিত এসকিউ-এফএস সোয়েটারে বকেয়া বেতন, ওভারটাইম এবং 'পিস রেট' বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে একপর্যায়ে মালিক সমর্থিত গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনের কর্মী এবং সরকারদলীয় ক্যাডাররা আন্দোলনে আপোস করতে শ্রমিকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। আন্দোলন অব্যাহত থাকলে একপর্যায়ে পুলিশি হামলার শিকার হয় শ্রমিকরা। বলাই বাহুল্য, তৎকালীন সরকার সমর্থিত শ্রমিক সংগঠনের কর্মী ও সরকারদলীয় ক্যাডারদের এ সময় পুলিশকে সহযোগিতা করতে দেখা যায়। এ ঘটনায় সোহাগ নামের এক শ্রমিক নিহত হয়।

> বেশকিছু ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এর একটি বড় অংশ গঠিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অথবা মালিকপক্ষের অর্থায়নে। ২০১৪ সালের আগস্টে তোবা আন্দোলনের ঠিক পর পর নৌমন্ত্রী শাজাহান খানের নেতৃত্বে ৫২টি শ্রমিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় গার্মেন্টস শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ। তবে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, এই জোটে ৫২টি সংগঠনের অস্তিত্ব নেই।

ওপরে বর্ণিত ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, গত এক দশকে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিবিধ সরকার তাদের সমর্থিত বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, ক্যাডার এবং পুলিশের সহায়তায় শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের আন্দোলনকে নানা কায়দায় দমন-পীড়ন করে আসছে। প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে একই ঘটনা বা একই 'প্যাটার্ন'-এর পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা গেছে।

বকেয়া বেতন-> অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ইত্যাদি-> শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন-> শ্রমিক ছাঁটাই-> সরকার সমর্থিত শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আপোসের চাপ-> শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আপোসে অস্বীকৃতি-> আন্দোলন অব্যাহত-> সরকারদলীয় ক্যাডার ও পুলিশের দমন-পীড়ন

ওপরের আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিক আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করতেই ব্যবহৃত হয়, যা রাষ্ট্র-ব্যবসা আঁতাতের একটি শক্তিশালী উদাহরণ।

মালিকপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় ট্রেড ইউনিয়ন

রানা প্লাজার ঘটনা এবং তোবা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্বব্যাপী সমালোচনা শুরু হলে আন্তর্জাতিক চাপের কারণে মালিকপক্ষের একটি অংশ নিজস্ব উদ্যোগেই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে আগ্রহী হয়। শুধুমাত্র তোবা আন্দোলন-পরবর্তী সময়েই প্রায় তিন শ নতুন ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের প্রমাণ পাওয়া যায়। অভিযোগ আছে, এর প্রায় সব কটিই মালিকপক্ষের সরাসরি সহযোগিতার ফসল। বলাই বাহুল্য, এ প্রক্রিয়ায় শ্রম অধিদপ্তর সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান না করলে এত দ্রুত সময়ের মধ্যে বিপুলসংখ্যক ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন পাওয়া আদৌ সম্ভব হতো না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরকার সমর্থিত একটি শ্রমিক সংগঠন মোট ছয়টি কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন পেয়েছে। বিজিএমইএ সমর্থিত একটি সংগঠনই পেয়েছে মোট ৩১টি ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন।

এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, স্বাভাবিক কারণেই মালিকপক্ষ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা ঘনিষ্ঠ শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রতি আস্থাশীল থাকে এবং নিজ কারখানায় এ ধরনের সংগঠনসমূহের ট্রেড ইউনিয়নভিত্তিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আপত্তি তোলে না।

বিজিএমইএর সহ-সভাপতি জনাব শহিদুল্লাহ আজিম একটি আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারে (২০১৪) বলেন, কতিপয় আন্দোলনকারী শ্রমিকের 'অন্যায্য' দাবিদাওয়া ও আন্দোলনের ফলে কারখানার উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলস্বরূপ অর্ডার বাতিল থেকে শুরু করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের পোশাক খাত। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতেই অনেক সময় নিজস্ব উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন করতে বাধ্য হয় পোশাক কারখানার মালিকরা। অর্থাৎ মালিকদের অর্থায়নে এবং সরাসরি সহযোগিতায় 'পোষা' ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অভিযোগটি বিজিএমইএর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিরাই অবলীলায় স্বীকার করেন।

মজুরি বোর্ড, মালিকদের আধিপত্য ও রাষ্ট্রপক্ষের ভূমিকা

১৯৯৪ সালে শ্রম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গঠন করা হয় প্রথম মজুরি বোর্ড। এই বোর্ডের সিদ্ধান্তে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয় ৯৩০ টাকা। এরপর দীর্ঘ ১২ বছর পর্যন্ত কোনো মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়নি। এখানে উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে এফএস গার্মেন্টসে মজুরি বৃদ্ধিসহ অন্যান্য দাবিতে জোরদার আন্দোলন শুরু হলে একপর্যায়ে শ্রমিক নেত্রী মোশরেফা মিশু গ্রেপ্তার হন। তাঁকে জেলে রেখেই ২০০৬ সালের ১২ জুন সচিবালয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সরকারের পক্ষে ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন শ্রম প্রতিমন্ত্রী আমানুল্লাহ আমান। মালিকপক্ষে স্বাক্ষর করেন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সভাপতিসহ সাতজন প্রতিনিধি। শ্রমিকপক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন ১৭টি শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক। উল্লেখ্য, স্বাক্ষরকারী ১৭টি সংগঠন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সদস্য, যার কোনোটিই গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিভিন্ন সময়ের আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। এছাড়াও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রায় ৩৯টি গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা সচিবালয়ের ওই সভায় উপস্থিত থাকলেও ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে এদের কারো স্বাক্ষর নেওয়া হয়নি। ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ও তখনকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালে নতুন করে মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। দীর্ঘ এক যুগ পর গঠিত এই মজুরি বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের নেত্রী নাজমা আখতার। উল্লেখ্য, মজুরি বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় মজুরি বৃদ্ধিসহ

অন্যান্য দাবিতে তৎকালীন চলমান আন্দোলনের সংগঠকদের ডাকা হয়নি।

পরবর্তী ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, এই ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ছিল চলমান আন্দোলন প্রশমিত করার একটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, যা স্বভাবতই মালিক স্বার্থের পক্ষেই অবস্থান করে। যেমন– শ্রমিকদের দাবি ছিল ন্যূনতম মজুরি কমপক্ষে তিন হাজার টাকা করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয় ১৬৬২.৫০ টাকা। চুক্তির ধারা-২ এ বলা আছে, আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গাজীপুর, টঙ্গী, সাভার ও আশুলিয়া থানায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহ প্রত্যাহার করতে হবে। অথচ আজ পর্যন্ত ওই সময়ে দায়েরকৃত বহু মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শ্রমিক নেত্রী মোশরেফা মিশুর বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো করা হয়, তার অধিকাংশই ফৌজদারি আদালতে এখন পর্যন্ত বহাল আছে।

ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ধারা-৩ এ আছে, আন্দোলনকারী কোনো শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হবে না। অথচ চুক্তির পর দেখা গেছে, বিভিন্ন কারখানায়ই শ্রমিক ছাঁটাই অব্যাহত ছিল। ধারা-৮ এ আছে, নিয়মিত বেতনভুক শ্রমিকদের দিয়ে আট ঘণ্টার বেশি কাজ করালে শ্রম আইন অনুযায়ী ওভারটাইম ভাতা দেওয়া হবে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, শ্রম আইন অনুযায়ী প্রতি বাড়তি কর্মঘণ্টা হিসাবে দ্বিগুণ 'ওভারটাইম ভাতা' দেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে শ্রমিকদের স্বাভাবিক কর্মঘণ্টার চেয়েও ৪৫ থেকে ৫৫ শতাংশ কম মজুরি দেওয়া হয়েছে। ধারা-৯ এ আছে প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করার কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কারখানাগুলোতে মাতৃত্বকালীন ছুটির বিধান থাকলেও অন্তঃসত্ত্বা নারী কর্মীদের কোনো রকমের নোটিশ ছাড়াই চাকরিচ্যুত করা হয়। ধারা-৬ এ আছে, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষির ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা হবে না। অথচ ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করা বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন এখন পর্যন্ত কী কী ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়, তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে দেশের বিদ্যমান শ্রম আইনে উল্লেখ থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এইসব আইন মানা হয় না বলেই ২০০৬ সালে নতুন করে ত্রিপক্ষীয় চুক্তিটি করার প্রয়োজন পড়েছিল। অথচ গত এক দশকে আমরা দেখেছি, বিভিন্ন কারখানার মালিকরা এই চুক্তির বেশির ভাগ শর্তই আমলে নেয়নি। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে অসংখ্য অভিযোগ থাকার পরও সরকার থেকে শ্রম আইন বা ত্রিপক্ষীয় চুক্তির শর্ত পূরণে কোনো চাপ প্রয়োগ করতেও দেখা যায়নি। বরং আমরা দেখেছি, গার্মেন্টস খাতের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে চুক্তি করার ফলে মাঠপর্যায়ের আন্দোলন সে সময় বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিল।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, সরকারে থাকা জনপ্রতিনিধিরা নিজ উদ্যোগে নিয়মিত বিরতিতে সংসদে মজুরি বৃদ্ধির বিল উত্থাপন করেন। ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী ক্রমাগত 'লবিং' করে গেলেও পার্লামেন্টে ভোটাভুটির মাধ্যমে মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব একবার গৃহীত হলে ব্যাবসায়িক গোষ্ঠীর বিরোধিতা করার আর সুযোগ থাকে না। বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশের কোনো সংসদেই আমরা আজ পর্যন্ত শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির ওপর কোনো আলোচনা হতে দেখিনি। বাংলাদেশে গত ৩০ বছরে গার্মেন্টস খাতের বিকাশের ইতিহাসে দেখা গেছে, শ্রমিকরা যতক্ষণ পর্যন্ত ন্যূনতম মজুরির দাবিতে রাস্তায় আন্দোলন না করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে কখনও ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। আগেই আলোচনা হয়েছে যে ১৯৯৪ সালে একটি মজুরি বোর্ডের মাধ্যমে গার্মেন্টস খাতের ন্যূনতম মজুরি ৯৩০ টাকা নির্ধারিত হওয়ার পর দীর্ঘ ১২ বছর কেটে গেলেও সরকারের পক্ষ থেকে মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারে কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি। ২০০৬ সালে শ্রমিকদের ব্যাপক আন্দোলনের চাপেই সরকার বাধ্য হয়ে মজুরি বোর্ড গঠন করে।

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরকার সমর্থিত একটি শ্রমিক সংগঠন মোট ছয়টি কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন পেয়েছে। বিজিএমইএ সমর্থিত একটি সংগঠনই পেয়েছে মোট ৩১টি ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন।

আমরা জানি, কাঠামোগতভাবেই মালিকপক্ষ শ্রমিকপক্ষের তুলনায় একটি শক্তিশালী অবস্থানে থাকে। এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের মতোই এদেশের সরকারের জনপ্রতিনিধিরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সংসদে বিল উত্থাপন করে মজুরির ক্ষেত্রে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন– এমনটাই কাম্য ছিল। সেক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা 'মেথোডলজি'র মাধ্যমে খাদ্যের বাজারদর, পুষ্টি, বাড়িভাড়া, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়কে আমলে নিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হতে পারত। অথচ তিন দশক ধরে আমরা দেখেছি, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণে একটি গ্রহণযোগ্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের কোনো নিজস্ব উদ্যোগ নেই। ৪০ লক্ষাধিক গার্মেন্টস শ্রমিকের জীবনমানকে আমলে না নিয়ে 'টেবিলের ওপারে মালিক– এপারে শ্রমিক' ধরনের একটি ব্যবস্থা চালু করে, মহাপ্রতাপশালী বিজিএমইএর বিপক্ষে একজন শ্রমিক প্রতিনিধিকে দরকষাকষির মঞ্চে একলা ছেড়ে দিয়ে ন্যূনতম মজুরির মতো একটি জাতীয় ইস্যু নির্ধারণে তথাকথিত নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা রাষ্ট্রপক্ষ যে আসলে মালিকপক্ষের স্বার্থই সংরক্ষণ করে তা বলাই বাহুল্য।

আর যদি মজুরি বোর্ড গঠন করেই ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হয়, সেক্ষেত্রে মজুরি বোর্ডের দরকষাকষির প্রক্রিয়ায় একটি 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্বও ছিল সরকারের। অথচ তা না করে বরং মজুরি বোর্ড নামক একটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মোড়কে মালিকপক্ষের ক্ষমতা চর্চারই আরেকটি সুযোগ করে দিয়েছে সরকার। এই মজুরি বোর্ডের গঠন এবং এর শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচন থেকে শুরু করে দরকষাকষির প্রতিটি প্রক্রিয়ায় দেখা গেছে সরকারের ইচ্ছাকৃত নীরবতা, মালিকপক্ষের অসম প্রভাব এবং শ্রমিকপক্ষের অসহায়ত্ব। বলাই বাহুল্য, প্রতিটি ধাপেই অত্যন্ত সুচতুরভাবে নিরপেক্ষ বা নীরব থেকে মালিকপক্ষকে একচ্ছত্রভাবে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ করে দেখুন, মজুরি বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় কোন প্রক্রিয়ায়? এই প্রতিনিধি নির্বাচন করার প্রক্রিয়াটিও যথেষ্ট অস্বচ্ছ এবং অগণতান্ত্রিক। সাধারণত শ্রম অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের

কাছে চিঠি দেওয়া হয় শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে। লক্ষ করুন, শুধুমাত্র নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নগুলোই এই চিঠি পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন, অনিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ (যারা দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রমিক অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার অথচ মালিকপক্ষ ও সরকারি অসহযোগিতার কারণে নিবন্ধন পেতে ব্যর্থ হয়েছে) ২০০৬ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সরকার থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করার প্রক্রিয়ায় কোনো চিঠি পায়নি। আবার আমন্ত্রণ পাওয়া নিবন্ধিত শ্রমিক সংগঠনগুলো যদিও মজুরি বোর্ডের জন্য প্রতিনিধি মনোনয়ন করে চিঠি পাঠানোর সুযোগ পায়, শেষ পর্যন্ত মজুরি বোর্ডের শ্রমিক প্রতিনিধি কে হবে, সেই সিদ্ধান্ত একচেটিয়াভাবে নেয় সরকার।

আমরা জানি, শ্রম আইন অনুযায়ী মজুরি বোর্ডে শ্রমিকদের পক্ষে অন্তত একজন প্রতিনিধি নিয়োগের বিধান আছে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, ২০০৬, ২০১০ ও ২০১৩ সালে গঠিত মজুরি বোর্ডে শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের অনেকেই সরকার ও মালিকপক্ষের সমর্থিত শ্রমিক সংগঠনের সদস্য। ২০০৬ সাল থেকে গঠিত প্রতিটি মজুরি বোর্ডেই দেখা গেছে, নিজ দল ও মালিকশ্রেণির অব্যাহত চাপের মুখে ওই নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধির পক্ষে আপোসহীনভাবে শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মজুরিসংক্রান্ত দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রে এই শ্রমিক প্রতিনিধিদের বক্তব্যকে সঠিকভাবে মূল্যায়নও করা হয়নি, যা শেষ পর্যন্ত মালিকপক্ষের স্বার্থই সংরক্ষণ করেছে।

চুক্তির ধারা-২ এ বলা আছে, আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গাজীপুর, টঙ্গী, সাভার ও আশুলিয়া থানায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহ প্রত্যাহার করতে হবে। অথচ আজ পর্যন্ত ওই সময়ে দায়েরকৃত বহু মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি।

২০০৬ সালে মজুরি বোর্ডের একজন শ্রমিক প্রতিনিধি মিডিয়ার সামনে অভিযোগ করেছিলেন যে, মজুরি বোর্ডে মজুরিসংক্রান্ত আলোচনায় তাঁর কোনো বক্তব্যকেই গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়নি। ২০১৩ সালের মজুরি বোর্ডের শ্রমিক প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, মজুরি বোর্ডে বিজিএমইএর প্রতিনিধি যে ধরনের ক্ষমতার চর্চা করেন, তার বিপরীতে একজন শ্রমিক প্রতিনিধির পক্ষে দরকষাকষি করে জিতে আসা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এখানে উল্লেখ্য যে, মজুরি বোর্ডের সভা চলাকালে মাঠের আন্দোলনও বলবৎ থাকে। এর কারণ হিসেবে একজন শ্রমিক সংগঠক জানান, শ্রমিক প্রতিনিধিরা মজুরি বোর্ডে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবেন–এ আস্থা না থাকায়ই মাঠের আন্দোলন এই সময়ে বেগ পেতে থাকে।

আগেই প্রশ্ন উঠেছে, মজুরি বোর্ডে একটি 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' তৈরি করে দিতে সরকার কী ভূমিকা পালন করে? উল্লেখ্য, সরকারি পক্ষ থেকে সে রকম শক্তিশালী কোনো প্রতিনিধির উপস্থিতি মজুরি বোর্ডে নেই। মজুরি বোর্ডে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে থাকেন সরকার সমর্থিত জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ। অভিযোগ আছে, সরকার সমর্থিত ফেডারেশনগুলোর শ্রমিক নেতাদের একটি অংশ বিভিন্নভাবে মালিকদের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তাদের প্রভাবশালী অংশকে বরাবরই মালিকপক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর থাকতে দেখা যায়। ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সরকারি প্রতিনিধিদের একটি অংশের বিরুদ্ধেও এ ধরনের অভিযোগ আছে।

আগেই বলেছি, প্রভাবশালী বিজিএমইএর বিপক্ষে শ্রমিক প্রতিনিধিদের পক্ষে এককভাবে দরকষাকষি করা একটি অত্যন্ত জটিল কাজ। ২০১৩ সালে বিভিন্ন পত্রিকায় আমরা দেখেছি, বিজিএমইএর প্রতিনিধিরা সরকারের কাছে কারখানার চাবি হস্তান্তর করে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, মালিকপক্ষের এ ধরনের হঠকারী 'ব্ল্যাকমেইল' বা ক্ষমতার চর্চার বিপরীতে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে কোনো ধরনের কঠোর ভূমিকা রাখতেও দেখা যায়নি।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, তিন দশকের গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশে রাষ্ট্র যে কেবল বিপুল পরিমাণ আর্থিক ও নীতিগত সহায়তাই দিয়েছে, তা-ই নয়; বরং শ্রম আইন, ট্রেড ইউনিয়ন, ন্যূনতম মজুরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুকৌশলে অব্যাহতভাবে পোশাক খাতের মালিকদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। শিল্প মালিকদের পক্ষে রাষ্ট্রের এই সচেতন অবস্থান বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে রাষ্ট্র-ব্যবসা আঁতাতের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ, যা প্রকৃতপক্ষে এদেশের ৪০ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণের পথে প্রধান অন্তরায়।

শেষ কথা

এই লেখায় বিশেষভাবে গার্মেন্টস শিল্পে রাষ্ট্রীয় সহায়তা, ট্রেড ইউনিয়ন ও মজুরিসংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্র ও মালিকপক্ষের পারস্পরিক আঁতাতের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, গার্মেন্টস খাতে রাষ্ট্র ও ব্যবসার যোগসাজশ বা আঁতাতের আরো অসংখ্য উদাহরণ আছে, যার সব কিছু সংগত কারণেই একটি লেখায় আলোচনা করা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে আলোচনার দাবি রাখে, এমন কিছু ইস্যু এখানে উল্লেখ করা হলো :

১। রানা প্লাজা ধসে নিহত ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণে রাষ্ট্র ও বিজিএমইএর ভূমিকা।

২। তাজরীনের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণে রাষ্ট্র ও বিজিএমইএর ভূমিকা।

৩। তাজরীনের মালিক দেলোয়ার হোসেনের মুক্তির ব্যাপারে রাষ্ট্রের ভূমিকা।

৪। শ্রম আইন কি শ্রমিকবান্ধব? এই আইন তৈরিতে মালিকপক্ষের প্রভাব ও রাষ্ট্রের ভূমিকা।

দুই দশকে মজুরি বোর্ডে দাবীকৃত ও অনুমোদিত মজুরির পার্থক্য

সাল	দাবীকৃত মজুরি	অনুমোদিত মজুরি
১৯৯৪	-	৯৩০ টাকা
২০০৬	৩০০০ টাকা	১৬৬২.৫০ টাকা
২০১০	৫০০০ টাকা	৩০০০ টাকা
২০১৩	৮০০০ টাকা	৫৩০০ টাকা

মাহা মির্জা : গবেষক।
ইমেইল: maha.z.mirza@gmail.com

শহিদুল ইসলাম সবুজ : শ্রমিক সংগঠক।
ইমেইল: sabuj.shahidul@gmail.com

পাদটীকা

১) এই অধ্যায়ে উল্লিখিত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত তথ্যসূত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিবেদন এবং প্রকাশিত গবেষণাপত্র থেকে সংগৃহীত।

২) এই অংশে উল্লেখিত নানা তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠক, কর্মী ও বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত গার্মেন্টস শ্রমিকদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতার মাধ্যমে সংগৃহীত।

বিভিন্ন সময়ে ও কয়েক দফায় যাঁদের আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে বা অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে তাঁদের পরিচিতি :

১। তাসলিমা আখ্‌তার, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি। কয়েক দফায় অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতা, সেপ্টেম্বর ২০১৪-ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

২। শামিমা আখতার, স্বাধীন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। দুই দফায় অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতা, অক্টোবর ২০১৪।

৩। নাজমা আখতার, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। অনানুষ্ঠানিক ফোন আলাপচারিতা, ২৪ মার্চ ২০১৫।

৪। সিরাজুল ইসলাম রনি, গার্মেন্টস শ্রমিক লীগ। অনানুষ্ঠানিক ফোন আলাপচারিতা, ২৩ মার্চ ২০১৫।

৫। শহিদুল্লাহ আজিম, সহ-সভাপতি, বিজিএমইএ। আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার, ২৩ অক্টোবর ২০১৪।

৬। শ্রমিক নেতা মাহবুবুর রহমান ইসমাইল। কয়েক দফায় অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতা।

৭। মমিনুর রহমান মোমেন, মিন্টু, সফিউল আলম আজাদ, রাজ্জাক, শাহ আলম, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম। কয়েক দফায় অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতা।

তথ্যসূত্র

[খান] Khan, Aminul Islam Mohammad (2011), "Labor Unrest in the RMG Sector of Bangladesh: A Public-Private Co-operation Perspective", Department of General and Continuing Education, North South University: Dhaka.

হোসেন, শওকত (২০১৩), 'দুই হাজার কোটি ডলারের পোশাক খাত এখনো সরকারনির্ভর', প্রথম আলো, ১৮ মে । Retrieved from http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/2763

আহমেদ, মনজুর ও জাহাঙ্গির শাহ (২০১৩),'সব কিছুই পোশাক মালিকদের জন্য', প্রথম আলো, ১৮ মে, । Retrived from http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/2773

[আহমেদ] Ahmed, M. N. and M. S. Hossain (2006), "Future Prospects of Bangladesh's RMG Industry and the Supportive Policy Regime", Mimeo, Bangladesh Bank: Dhaka.

[ইসলাম] Islam, Mafizul A. F. M. (1984), "Notes on the Growth of Bangladesh Garments Industry", The Journal of Management Business and Economics, vol. 10, no. 4, p. 536.

[মাহমুদ] Mahmood, S.A. (2002), "How the Bangladesh Garment Industry Took Off in The Early Eighties: The Role of Policy Reforms and Diffusion of Good Practices", Alochona Magazine

[রক] Rock, M. (2001), "Globalisation and Bangladesh: The Case of Export Oriented Garment Manufacture", South Asia, vol. 24, no. 1, pp, 201-225.

[ইসলাম] Islam, Sadequl (2001), The Textile and Clothing Industry of Bangladesh in a Changing World Economy, CPD and The University Press Ltd.: Dhaka.

[সিপিডি] CPD (2002), "Coping with Post-MFA Challenges: Strategic Responses for Bangladesh RMG Sector", CPD Dialog Report No. 55, CPD: Dhaka.

[জাহান] Jahan, Sarwat (2005, "The End of Multi-Fiber Arrangement: Challenges and Opportunities for Bangladesh", WBI Policy Note.

[সিদ্দিকী] Siddiqi, Hafiz G. A. (2004), The Readymade Garment Industry of Bangladesh, The University Press Ltd.: Dhaka.

[মির্জা ২০১৪] মাহা মির্জা: "রাষ্ট্র ব্যবসা আঁতাত: বিদ্যুৎ খাতের লুটপাট এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অলিগার্কিক চেহারা"। সর্বজনকথা ১ম সংখ্যা নভেম্বর ২০১৪।